ষোড়শ শতাব্দী। দক্ষিণ ভারত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দ্বন্দ

তুঙ্গভদ্রার দেশে

এন.এস.বিশ্বনাথ

ভাষান্তর

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

প্রাককথন

মধ্য ষোড়শ শতাব্দী, বিজয়নগর সাম্রাজ্য।

বিজয়নগরের রাজধানীতে সম্রাট অচ্যুত রায়ার মৃত্যু হইয়াছে, যিনি তাহার স্বনামধন্য অগ্রজ কৃষ্ণদেব রায়ার পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অচ্যুত রায়ার শ্যালক সঙ্কারাজু নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক শাসক ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রামা রায়া, যিনি বহুদিন ধরিয়া সেই রাজসিংহাসনের প্রত্যাশী। তিনি কৃষ্ণদেব রায়ার জামাতা, সেজন্য ইহাই প্রত্যাশিত ছিল যে তিনিই কৃষ্ণদেব রায়ার শিশুপুত্রের অভিভাবক রূপে বিজয়নগর সাম্রাজ্য শাসন করিবেন। কিন্তু সেই শিশুপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় অচ্যুত রায়া সিংহাসন অধিকার করেন। অচ্যুতরায়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার বহু ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর রামারায়া বর্তমানে সেই সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট এক বিদ্রোহী। সমস্ত সাম্রাজ্যে তার অনুগামী অসংখ্য বিদ্রোহী তার সমর্থক।

সঙ্কারাজু অথবা রামা রায়া, কাহারও রাজরক্তের উত্তরাধিকার নাই এবং সেজন্য তাহাদের কাহারও ন্যায়সঙ্গতভাবে সিংহাসন অধিকার করা সম্ভব নহে। সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী কৃষ্ণদেব রায়ার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব। কিন্তু সদাশিবও অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং তাহার সম্রাট হওয়া সম্ভব নয়..... এবং সে সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

রামা রায়া এবং সঙ্কারাজু, যিনিই সেই শিশুপুত্রকে উদ্ধার করিতে পারিবেন তিনিই তাহার প্রতিনিধি এবং অভিভাবক রূপে বিজয়নগর সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন।

রাজধানী হইতে বহুদূরে, মধুবন নামক এক উদ্যানপল্লীতেও এমনই এক উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রারম্ভ হইয়াছে যাহা রাজপরিবারের ক্ষমতার অলিন্দের সেই সংঘাতেরই অনুরূপ...

১

আদর্শিনীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর এক নির্জন অমাবস্যার মধ্যাহ্নে তাহার আঁখিপল্লব নিরন্তর কাঁপিতে থাকে। সেদিন তাহার প্রিয় পুত্তলিকাটিও হারাইয়া যায়। সেই বৎসরেই তাহার মাতা ও পিতার মৃত্যু হয় নৌকাডুবিতে। সেদিনও তাহার বাম আঁখিপল্লব সমস্ত দিন কাঁপিয়াছিল। বাম চক্ষের কম্পন যে অশুভ ইঙ্গিতবাহী আদর্শিনী তাহা উপলব্ধি করে শিশুকালেই। তাহার পর তাহার বাম অক্ষিপল্লব বহুবার কম্পিত হইয়াছে। কিন্তু আদর্শিনী দেখিয়াছে যে এই সময়ে রাজঘোষকের আবির্ভাব হইলে তাহা যেন যে কোনোও অপ্রিয় ঘটনার সম্ভাবনাকে দূর করিয়া থাকে।

সেজন্য, এক প্রভাতে যুবতী আদর্শিনী যখন রাজঘোষকের ঢাকের শব্দ শুনতে পাইল সে তাহার চক্ষের কম্পনকে অগ্রাহ্য করিয়া হাসিমুখে বিস্তীর্ণ নীলাকাশ ও বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরের পার্শ্ববর্তী কদলীবনে আসিয়া দেখিতে পাইল তাহার দাসী সরলা কদলীর কাঁদি কাটিবার তদারকিতে ব্যস্ত।

এই সেই মধুবন; তাহার স্বামী গোষ্ঠী অধিপতি রাজন্নার সুবিশাল ভূসম্পত্তি। আদর্শিনী এই নৈসর্গিক সদ্য প্রস্ফুটিত অন্তহীন যুঁইফুলের উদ্যান ও সবুজের রাজ্যের রানি। সে দীর্ঘ শ্বাস লইয়া যুঁইফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিল। সে একটি ফুল তুলিয়া চুলে লাগাইল ও নত হইয়া পায়ের নূপুর ঠিক করিতে গিয়া ফুলটি পড়িয়া গেল। সে বিরক্তিসূচক শব্দ করিল। সরলা বলিল, ''আমি তোমায় সাহায্য করছি আক্কা''। আদর্শিনী তাহার দাসীদের মধ্যে সরলাকেই সর্বাধিক বিশ্বাস ও ভরসা করিত এবং কখনোই একাকী উদ্যানের গভীরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। যদিও মধুবনের পরিবেশ অতি মনোরম ও শান্ত, যাহার মধ্য দিয়া বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের বুক চিরিয়া ছোট্ট নদী অমৃতা প্রবাহিত হইতেছে, যাহার চারিপাশে নারিকেল ও কদলীবৃক্ষের সারি তাহাদের অতি বৃহৎ গৃহ পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে, আদর্শিনী জানিত যে এই বন সর্প অধ্যুষিত, বনের বহু পায়ে চলা পথ গোলক ধাঁধাঁর ন্যায় বিভ্রান্তিকর, যেখানে প্রায়ই চিতাবাঘের ঘ্রাণ বাতাসে ভাসিয়া আসে। যদিও এখানে কখনও বাঘের উপদ্রব হয় নাই, আদর্শিনী তাহার স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী বনের ভিতর যাইতে

হইলে সর্বদাই সরলাকে সঙ্গে লইয়া যাইত এবং একজন কৃষাণ তাহাদের অনুগমন করিত। আদর্শিনী কয়েকবার একাকীও সেই বনে প্রবেশ করিয়া গোপন রোমাঞ্চ অনুভব করিয়াছিল।

সরলা যত্নভরে আদর্শিনীর জানু পর্যন্ত আলুলায়িত দীর্ঘ কেশদামে কবরী রচনা করিয়া কহিল, ''তোমায় মন্দিরের দেবীর মতো দেখতে লাগছে আক্কা''। আদর্শিনী হাসিল। মন্দিরের চারিপার্শ্বের প্রস্তরস্তম্ভগুলিতে ক্ষোদিত করা দেবীমূর্তিদের কথাই বলিতেছিল সরলা—ধূসর, কৃশতনু, সুন্দর, কৌতুকময় চক্ষু ও নিখুঁত বক্ষসৌন্দর্য। আদর্শিনী লজ্জায় আরক্তিম হইল। ''চল সরলা। আমরা মধুবনের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত যাই। কতদিন যে যাইনি আমরা অতদূরে।'' ধান্যক্ষেত্রের আলের উপর দিয়া তাহারা সাবধানে চলিল। সম্মুখে আদর্শিনী, কর্মরত কৃষাণদের উদ্দেশ্যে হস্ত আন্দোলিত করিয়া হাস্যমুখে চলিল। ধান্যক্ষেত্রের পর অসংখ্য সারিবদ্ধ তিন্তিলীবৃক্ষের সারির মধ্য দিয়া পায়ে চলা পথের গোলকধাঁধাঁ অগ্রসরিত হইয়াছে মধুবনের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। ইহাই আদর্শিনীর জগতের বহির্সীমা, ইহার পরই মারাভলী গ্রামের প্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এরই বক্ষে সর্পিল ধূলিধূসর পথ অমৃতা নদীর ধার দিয়া যেন অনিচ্ছাভরে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছে। মারাভলীর সীমানায় বহুযুগ ধরে নীরবে অবস্থান করিতেছে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ও পুরাতন রামমন্দির।

বহুদূর হতে ঘোষকের ঢাকের শব্দ শোনা যাইতেছে। আদর্শিনী সরলাকে বলিল, ''কত বছর হয়ে গেল। আমি রাজন্নার স্ত্রী কিন্তু তিনি কখনও আমায় গ্রামের বাইরে নিয়ে যাননি।'' সে বুঝিতে পারিত না মারাভলীর সর্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাহাকে কোনো অনুগামী পরিবেষ্টিত না হইয়া মধুবনের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। ''শুধু তোমারই মঙ্গলের জন্য,'' রাজন্না তাহাকে বারে বারে বোঝাইতেন।

সরলা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ''কেন আক্কা! তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে? রাজন্না তো ঠিকই বলেন। সেখানে যা ঘটে তা শুধুমাত্র পুরুষদের এবং শিশুদেরই জগৎ।'' আদর্শিনী জানিত তাহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র রঘু মধুবনের অন্যান্য বালকদের সহিত ঘোষকের ঘোষণা শুনিতে গিয়াছে। তাহার মনে পড়িল শিশুকালে তাহাদের গ্রামে ঘোষক আসিলে সেও শিশুদের সহিত এমনিই ছুটিয়া যাইত। ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বলিত, ''শোনো, শোনো, মহান বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণ, হে প্রজাবৃন্দ...''। শিশুকালে সে ঘোষকের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিত। আদর্শিনীর মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; সে যে কতদিনের পুরানো কথা।

নবগিরি আশ্রমে শৈশবকালের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা ও বিধবাদের প্রতিপালনের জন্য সেই আশ্রম নির্মিত হইয়াছিল একটি মন্দির সংলগ্ন উপগৃহে। আদর্শিনী শুনিয়াছিল তাহার পিতা-মাতা নারায়ণের দর্শন করিতে বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন এবং একদিন তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সে জানিত যে তাহারা জলে ডুবিয়া গিয়াছেন। তাহার বাল্যস্মৃতিতে আশ্রমটি আনন্দের স্থান ছিল। সে বন্ধুদের সহিত খেলা

করিত ও স্নেহময়ী বয়স্কা বিধবাদের নিকট পুরাণের কাহিনি শুনিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বাল্যবিধবা ছিলেন। তাহারা সকলেই বলিতেন, ''দুঃখ কোরো না মা! প্রভু নারায়ণ আমাদের সহায়। তিনিই আমাদের রক্ষা করে থাকেন।'' আদর্শিনী দেখিতে পাইত এমন আশ্বাস দেওয়ার সময় তাহাদের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিত; কেন, তাহা কিন্তু সে বুঝিতে পারিত না। মাঝে মাঝে প্রাপ্তবয়স্ক পুরোহিতরা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে শিশুরা নিদ্রা যাইবার পর যুবতী বিধবাদের সহিত কথা বলিতে আসিতেন। আদর্শিনী তখন নারীদের হাস্য কলরোল শুনিতে পাইত; এবং তাহাদের জন্য আনন্দ অনুভব করিত।

তাহার যখন দ্বাদশ বৎসর বয়স, একদিন আদর্শিনীকে বলা হইল গ্রামের জ্যোতিষী মারাভলীর এক সম্পন্ন ব্যবসায়ীর সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। মারাভলী সে স্থান হইতে মাত্র সাত দিনের গোশকট যাত্রার পথ। সেখানে সে রাজরানির ন্যায় থাকিবে।

যখন আদর্শিনী রঙিন পুষ্প-পত্রাদির হারে সুসজ্জিত গোশকটে আরোহণ করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিল, আশ্রমবাসিনীরা চক্ষের জলে তাহাকে বিদায় দিল। আদর্শিনীর পার্শ্বে রাজন্নাকে রাজার ন্যায় মনে হইতেছিল—যেমন সে শিশুকাল হইতে রূপকথার গল্প শুনিয়া কল্পনা করিয়াছিল। সে রাজন্নাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তিনি কি আদর্শিনীকে তাহার বান্ধবীদের সহিত দেখা করাইতে পুনরায় এখানে লইয়া আসিবেন। রাজন্না সম্মত হইয়াছিলেন। সে দশ বৎসর পূর্বের কথা। যদিও রাজন্না সে কথা রাখেন নাই, আদর্শিনী তাহার স্বামীকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার চক্ষে রাজন্না ছিলেন বুদ্ধিমান, শক্তিমান, গরিমায় সহৃদয়; যে কোনো সম্রাট হইতে অন্যূন।

জুঁইফুলের সুগন্ধবাহী মৃদুমন্দ বায়ু আদর্শিনীর অলকদাম আন্দোলিত করিতেছিল। ''অমাবস্যা কবে?'' সে সরলাকে অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল। ''কেন আক্কা? অমাবস্যার দিন কী হবে?'' আদর্শিনী অদ্য প্রাতকাল হইতে বহুবার এই প্রশ্ন করিয়াছে। সে অমাবস্যার পূর্বেই রাজন্নার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা করিতেছিল।

কৃষাণরা সমস্ত দিনে প্রচুর কদলীর কাঁদি কাটিয়াছিল। আদর্শিনী সরলাকে বলিল, ''যথেষ্ট হয়েছে। তুই ওদের কলাগুলো নিয়ে গিয়ে বাড়ির উঠোনে রাখতে বল।'' কৃষাণরা কলার কাঁদি লইয়া গৃহ অভিমুখে চলিল। আদর্শিনী মন্থর পদে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। এই পথের শেষে তাহার গৃহ। অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকানির্মিত ইষ্টক দ্বারা নির্মিত চর্তুপার্শ্বে আনত চতুর্চালার চারটি গৃহ বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এগুলির কেন্দ্রে স্থিত আরও একটি এমনই গৃহ। তাহার চতুষ্পার্শ্বে নীলাকাশের পটভূমিকায় সুউচ্চ নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণি দৃশ্যমান। মধুবনের প্রবেশদ্বার তাহার বহির্জগতের কেন্দ্রস্থল।

আদর্শিনী ভাবিল, 'এই সেই পাঁচটি গৃহ। আমি যখন রাজন্নার নববধূ হয়ে এখানে প্রথম আসি, তখনও তা এমনই ছিল। চারপাশ ঘিরে নিচু আচ্ছাদিত দাওয়া। আঙ্গিনায় দোলনা, বড়ো বড়ো ঘর, মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ, আর উত্তর-পূর্ব কোনায় আমার ওই ঘর।

আমায় তখন বলা হয়েছিল আমি এই বাড়িতেই বাস করব, আমার স্বামী ও তার অন্য দুই পূর্বতন স্ত্রীর সঙ্গে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এই পাঁচটি বাড়ির একটি হতে অপর যে কোনো গৃহে বৃষ্টিতে না ভিজেই যাওয়া যায়। এমন আমি পূর্বে কোথাও দেখিনি। লুকোচুরি খেলার আদর্শ স্থান! আমি তখন তাই ভেবেছিলাম। বাড়ির শিশুদের সাথে খেলা করতে মন চেয়েছিল। কিন্তু আমায় বলা হয়েছিল আমার আচরণ যেন গৃহবধূর মতো হয়। ফুলের বাগান, বহির্বাটী, গোশালা, অশ্বশালা, গোলাঘর— আমি রাজন্নাকে অবাক হয়ে বলেছিলাম, স্বর্গও নিশ্চয় এত সুন্দর নয়।'

গৃহে ফিরিয়া আদর্শিনী সরলাকে বলিল, ''সকলকে জানা যে আজ অনেক কলার কাঁদি এসেছে।'' আঙ্গিনায় যাইয়া সে দেখিতে পাইল তাহার দুই সতীন, চেলুভী ও কলাবতী কপোতযুগলের ন্যায় আলস্যসুখে ঝুলনায় দোল খাইতেছে। কলাবতী কৃশকায়া, দীর্ঘাঙ্গী। চেলুভী নাতিদীর্ঘ ও পৃথুলা। কলাবতী চল্লিশোর্ধ, সদা আনন্দমুখর। পঞ্চাশোর্ধ চেলুভী সদা মৃদুভাষী; কিন্তু স্বামীর সহিত কলহকালে অতি মুখরা ও সোচ্চার।

আদর্শিনী খেলাচ্ছলে তাহাদের দিকে কয়েকটি কদলী ছুড়িয়া দিল। কলাবতী স্নেহভরে বলিল, ''আয় রে, আয়! একটু বিশ্রাম কর। মনে হচ্ছে বড্ড পরিশ্রম গেছে তোর সকাল থেকে।'' আদর্শিনী যখন নববধূ রূপে এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করে, তখন সে বালিকা। শৈশবেই অনাথ আদর্শিনী রাজন্নার কর্মব্যস্ত সংসারে আসিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিল। পরিবারের বিশালত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া সে কলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কাহারা কে, এবং কাহারা মধুবনের অভ্যন্তরে বাস করে। তাহার সাথে সে সুপ্রচুর বদান্য উপদেশও লাভ করিয়াছিল যাহা পরবর্তী কালে আদর্শিনীর জন্য অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল, ''এখানে কারও নাম মনে রাখার বৃথা চেষ্টা করিস না। রাজন্নার কোনো ভাই বোন নেই; চেলভীরও নেই। রাজান্যর পিতা-মাতা কেউই জীবিত নেই; চেলভীরও নেই। শুধু মনে রাখবি, আমার এক ভাই আছে, সেও এখানে থাকে না। যারা বাস করে তারা সকলেই কোনো না কোনো প্রকার আত্মীয়— দাদু, দিদা, কাকা, কাকি, তুতো-ভাইবোন, ভাগ্নে, ভাইপো। প্রথমে এরকম সকলেই চেলভীর আত্মীয় ছিল। আমি আসার পর আমার এমন আত্মীয়রাও রাজন্নার পরিবারভুক্ত হয়েছিল। রাজন্না অত্যন্ত বড়ো মনের উদার মানুষ। বর্তমানে আমাদের ছাড়া এখানে বাস করেন দুইজন বৃদ্ধা বিধবা, এক বৃদ্ধ বিপত্নীক, সাতটি বিবাহিত দম্পতি, দশটি বালক, তেরোজন বালিকা যারা সকলেই তোর চেয়ে বয়সে ছোটো, এবং বিবাহযোগ্য, চারজন অবিবাহিত পুরুষ, বারোটি গোরু, কুড়িটি মহিষ, চোদ্দজন দাসী, অসংখ্য কৃষাণ, এবং অগণিত ছাগল। বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের শুধু আক্কা বলে সম্বোধন করবি, পুরুষদের নাম ধরে সম্বোধন করবি না, এবং অবশিষ্টজনের জন্য কিছু নাম ঠিক করে নিবি, যেমন আমি করতে শিখে গেছি। আদর্শিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'আর আমাদের স্বামীর আত্মীয়-স্বজন?' কলাবতী বলিল, ''ওনার পরিবারের

সকলেরই বহুদিন পূর্বেই প্লেগে মৃত্যু হয়েছে। তার আর কোনো আত্মীয় অবশিষ্ট নেই।" ''আমারও কেউই নেই,'' আদর্শিনী বিষণ্ণ স্বরে বলিল।

পুরানো একটি কথা স্মরণে আসায় আদর্শিনী মনে মনে হাসিয়া ফেলিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল চেলুভী, যাহাকে দীর্ঘকায় রাজান্যর পার্শ্বে বামনাকার মনে হইত, তীব্রস্বরে স্বামীর সহিত কলহ করিতেছিল। ''তুমি এমন কাজ কী করে করলে? বৃদ্ধ, ভাম। আদর্শিনী একটা বালিকা মাত্র, বুঝেছ বৃদ্ধ মূর্খ।" উত্তেজনায় তাহার রুপালি কেশদাম প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। ''দেখো, মেয়েটিকে একবার দেখো! তার স্তন এখনও লেবুর মতো ক্ষুদ্র।"

বালিকা আদর্শিনী পরবর্তী কালে চেলুভীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ''লেবুর মতো ক্ষুদ্র বক্ষ থাকা কি ভুল, আক্কা!' চেলুভী সহাস্যে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিল, 'চিন্তা করিস না বালিকা। আমার স্তন পূর্বে তোর চেয়েও ছোটো ছিল। এখন তাদের দেখ!' চেলুভী তাহার শরীরের অনুপাতে সুবৃহৎ বক্ষের প্রতি নির্দেশ করিয়াছিল। আদর্শিনী পরে বুঝিয়াছিল প্রায় সকল পুরুষই চেলুভীর সুবৃহৎ বক্ষের প্রতি অপাঙ্গে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়া থাকে।

চেলুভী ও কলাবতী আদর্শিনী হইতে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া স্বত্বেও তাহাকে বক্ষের মাঝে আশ্রয় দিয়াছিল এবং তাহার যৌবনের সন্ধিক্ষণ, যৌনচেতনার উন্মেষকাল, সন্তান ধারণ, সংসারের জটিলতা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাকে অবহিত করিয়াছিল। তাহাদের উভয়েরই তিনটি করিয়া কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল যাহারা বিবাহের পর দূর স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছিল। ষাট বৎসর বয়সে রাজন্না তৃতীয়া পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন পুত্রলাভের আশায়। আদর্শিনী আশঙ্কা করিয়াছিল যে তাহার সতীনেরা তাহাকে অত্যাচার করিবে এবং প্রতিপদে তাহার ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট থাকিবে। নবগিরির বিধবারা তাহাকে সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু আদর্শিনীর সতীনেরা তাহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা প্রীত হইয়াছিল যে রাজন্নার নববধূ তাহাদের স্বামীকে সেই উত্তেজনার রসদ যোগান দিতেছে যাহা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আদর্শিনী রঘুকে জন্ম দেয় এবং মধুবন অবশেষে পুরুষ উত্তরাধিকারী লাভ করে। আদর্শিনীর পুত্রলাভের পর চেলুভী ও কলাবতী তাহাকে ঘিরিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছিল।

চেলুভী বলিল, ''আমাদের আদর্শিনীকে আজ বড়ো প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে, জুঁইফুলের সুগন্ধে ভরা, উজ্জ্বল। কী ব্যাপার?" আদর্শিনী বলিল, ''আমি মধুবনের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! আমরা তিনজনে একদিন একসাথে মারাভলীর বাইরে চলে যাব।" ''নিশ্চয়, নিশ্চয়", কলাবতী এই প্রস্তাবকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়াই বলিল। ''মনে হচ্ছে এরপর সে বিজয়নগরের সম্রাটকে দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব করবে।" তাহারা জানে যে রাজধানী এই স্থান হইতে পশ্চিমে গোশকটে পনেরোদিনের পথ। চেলুভী বলিল, 'হয়তো! কোনোদিন! রাজন্না ফিরে আসার পর। তার তো কিছুদিনের

মধ্যেই ফিরে আসা উচিত। আয়, আমাদের কাছে আয়।" আদর্শিনী বলিল, ''কিন্তু তিনি যদি শীঘ্র না আসেন আমি কিন্তু একলাই নদীর ধারে, চলে যাব, তোমরা না এলেও। তোমরা শুধু দেখো।" তাহার দুই সতীন শুধু হাসিয়া উঠিল এবং আদর্শিনীকে ঝুলনায় তাহাদের মধ্যে বসাইল। সে চেলুভীর স্কন্ধে মাথা রাখিল, চেলুভী দোলনায় দোল দিতে দিতে তাহার কপালে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল।

আদর্শিনীর সুখাবেশ সহসা তুমুল হৈ চৈ ও চিৎকারে বিঘ্নিত হইল। শিশুরা মারাভলী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা আদর্শিনীকে ঘিরিয়া ধরিল। রঘুও তাহাদের মধ্যে একজন। তাহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্রের মুখ আনন্দউদ্ভাসিত। সে সকলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। আদর্শিনী মুহূর্তের জন্য রঘুর মধ্যে গুম্ফধারী, সিংহবিক্রম, বলিষ্ঠ এক যুবাপুরুষের অবয়ব দেখিতে পাইল, ঠিক তাহার পিতার ন্যায়। সে বলিল, ''আমার রাজপুত্র ধুলো মেখে এসেছে। তার মা তাকে এখন পরিষ্কার করে দেবে।" শাড়ির আঁচল দ্বারা সে রঘুর মুখ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

চেলুভী ও কলাবতী ঝুলনা হইতে নামিয়া পাচকদের তত্ত্বাবধান করিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। আদর্শিনী শুনিতে পাইল তাহারা চিৎকার করিয়া নির্দেশ দিতেছে। সে নিজেকে সুবিন্যস্ত করিয়া রঘুকে বলিল, ''বলো। তোমরা মারাভলীতে কি করলে?" ''আমরা তেঁতুল গাছের নীচে খেলা করলাম," সে বলিল। ''আমরা ঘোষকের ঢাক নিয়ে খেলা করতে চাইলাম কিন্তু সে আমাদের নিষেধ করল। সে বলল যে কিছুদিনের মধ্যেই সে এখানে আসবে।" আদর্শিনী ঘোষকদের নাম জানিত না। তাহার জন্য সকল ঘোষকই ঘোষক মাত্র যাহারা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর হতে অন্যান্য শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্রাট ও তাহার কর্মচারীদের রাজানুদেশ উচ্চস্বরে ঘোষণা করিত। কী উত্তেজনাপূর্ণ তাহাদের জীবন, কত স্থানে যে তাহারা ভ্রমণ করিয়াছে, কত মানুষজনের সাথে তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, আদর্শিনী কেবলই ভাবিত। কিন্তু সে শুধুই ভ্রমণের স্বপ্ন দেখিতে পারিত মাত্র। স্ত্রীজাতি ভ্রমণ করে না—আশ্রমের বিধবাদের নিকট সে সর্বদাই শুনিত। স্ত্রীজাতি কেবল ভ্রমণের কাহিনি শুনিবে মাত্র। কেবলমাত্র পুরুষেরা দুঃসাহসী হইবে, তাহারা বহুদূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিবে। বিবাহের পরও তাহার জীবনে কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

আদর্শিনী অন্যান্য বালকদের প্রতি মনোযোগ দিল। ''তাহলে। ঘোষক আর কি বলল? ক্ষত্রপ মহাশয় মারাভলীতে আসছেন কি? আমাদের মন্দিরে কি নুতন হাতি আসবে? দুষ্ট তুর্কা রাজারা আমাদের আক্রমণ করবে কি? না কি আমাদের সম্রাট তাদের আক্রমণ করবেন? বিজয়নগরে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কি? আগামী পশুমেলা কবে আয়োজিত হবে? নটের দল কি শীঘ্রই এখানে আসবে?" শিশুরা এমন গুরুত্ব পাইয়া আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। ''শোনো, শোনো, হে মারাভলীর আধিবাসীবৃন্দ। মহান বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অনুগত প্রজাগণ। তোমাদের প্রভু ও স্বামী ....."। রঘু ঘোষকের অভিনয় করিয়া দেখাইল। আদর্শিনী হাসিয়া ফেলিল। তাহাকে প্রীত করিবার জন্য শিশুদের মধ্যে